সমাজসত্তা, ও সমাজসচেতনা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

তরুণ সান্যাল

এক

যুগের সঙ্গে যুগমানসের থাকে হরগৌরী সম্পর্ক, এমন কথাই সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন। কোনো ব্যক্তির উদ্ভব তো আর সমাজনিরপেক্ষ নয়। যাঁদের যুগাবতার বলি, পরমপুরুষ বলি, তাঁরাও তাঁদের নিজযুগের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হন। ইতিহাসের গতিপথে রয়েছে নানা সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোর পরম্পরা। এক একটি অর্থনৈতিক ভিতের উপরে গড়ে ওঠে এক একটি সমাজের ওপরতলা। মানুষের অভাব মেটাবার সামগ্রী উৎপাদন করতে গিয়ে গড়ে ওঠে যে মানুষে - মানুষে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সম্পর্ক, ঐ সম্পর্কের সমষ্টিই আমরা বলব অর্থনৈতিক গঠন। ঐ গঠনই হল সামাজিক সত্তা। আর্থ-সামাজিক অবস্থার যা সারাৎসার। ঐ অর্থনৈতিক কাঠামোই– সমাজের কে কোথায় দাঁড়িয়ে–তার ব্যক্তিসত্তা নিরূপণ করে দেয়। নিরূপণ করে তার চেতনার স্তরও। ঐ বনিয়াদ যদি বদলে যায় উপরতলাও বদলে যায় কমবেশী দ্রুততায়। বদলে যায় সামাজিক চৈতন্য, অর্থাৎ আইন, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিকতা, নন্দন-তত্ত্ব ও দর্শনের দিকগুলি। ঐ বৈষয়িক অবস্থার সমস্তটাই এক করে হেগেল নাম দিয়েছেন 'পৌর সমাজ' বা সিভিক সোসাইটি। তবে কি পুরনো দিনের কোনো স্মৃতিই মানুষ মনে রাখে না? এমনকি যান্ত্রিক সম্পর্ক মানুষের চেতনার স্তরের সঙ্গে মানষের সমাজসত্তার, বা অর্থনৈতিক বনিয়াদের? ইতিহাসের ঊষাকালে সামাজিক চৈতন্য সোজাসুজি উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমষ্টির উপর নির্ভর করে। যতই শ্রেণীসম্পর্ক জটিল হয়েছে ততই আইনকানুন, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি নানা মধ্যবর্তী সংযোজক দিয়ে সামাজিক চৈতন্য নিরূপণ করেছে। তাই কেউ যদি সোজাসুজি বলেন 'যৎ শ্রেণীসম্পর্কং তৎ সমাজচৈতন্যং' তা হলে অতি সরলীকরণ ও গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট, ভালগারাইজেশন। উপরতলা বা সমাজচৈতন্যও সামাজিক সত্তার উপরে প্রভাব ফেলে। সামাজিক সত্তার উপরে নির্ভরশীল হলেও সমাজচৈতন্যের নানা দিকগুলি যথেষ্ট আপেক্ষিক স্বাধীনতাও থাকে। তদের স্বকীয় বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগান হয়। তাই সামাজিক সত্তা ও সামাজিক চৈতন্য একেবারে খাপে খাপে মিলিয়ে দেবার মত নয়। বরং সামাজিক চৈতন্যের নিজস্ব চৈতন্য জাড্যতা আছে। আর তা আছে বলেই, নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদের পর্যায়ে, বা পরিবর্তমান সম্পত্তিসম্পর্কের সময়, পুরনো ও প্রচল সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে নতুন চৈতন্যের লড়াই চলে, এবং শেষ পর্যন্ত সে লড়াইয়ের নিরসনও হয়। তবু বহু পুরনো চৈতন্যের জন্মদাগ নতুন চৈতন্যের গায়ে থেকে যায়। এমন-কি অন্তর্গতও থাকে।

তা ছাড়া অন্যতর পরিবেশই-বা আমরা বাতিল করব কি করে। যেমন আবহাওয়া, ভূগোল, ভূমির গঠনবৈচিত্র্য, বা নৃতাত্ত্বিক-শরীর গঠন। কার্ল মার্কস এমনি কি বলেছিলেন যে, ভ্রাম্যমান ট্রাইব স্থায়ী বসবাসের স্থিতি পেলেও সঙ্গে রয়েই যায় ট্রাইবটির স্বভাবপ্রকৃতির বেশ কিছুটা। 'স্বভাব যায় না মলে'। উচ্চতর সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোর উচ্চতর ধাপ পরম্পরায় যেতে যেতে যে স্বভাব বদলাতে থাকে। তবু এখানে যে আমরা আর্যভাষাভাষী ট্রাইবদের রচিত বেদকে শ্রদ্ধেয় বলে মানি, ক্লাসিকাল যুগে উদ্ভুত উপনিষদকে স্বামী বিবেকানন্দ কথিত 'প্র্যাকটিকাল বেদান্ত' চিন্তার কাজে লাগাই, তারও কারণ আমাদের সামাজিক চৈতন্যের কোনো কোনা ক্ষেত্রে এগুলির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কেননা, ঐ সব রচনার ব্যাখাগত ভাবাদর্শমূল দিক 'বস্তুগত শক্তি' অর্জন করেছে বলে। এ কারণে বহু সমাজ সংস্কার, এমন কি সমাজবিপ্লবীকেও পুরনো ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিতে হবে।

মোটা হিসাব নিলে বলা যায় চৈতন্যদেবের কালে সভ্য পৃথিবীর ইতিহাস জলবিভাজিকার রূপ নিচ্ছিল পুরনো সামন্তবাদ ও নতুন মানবতন্ত্রের মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৪ খ্রীঃ) এবং মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৩৯ খ্রীঃ) ও টমাস মুয়েনৎসার (১৪৯০-১৫২৫খ্রীঃ) বিপুল ভৌগোলিক ব্যবথান সত্ত্বেও সমসাময়িক। তাছাড়া ভারতে কবীর (আনুমানিক ১৩৮০-১৪১৪ খ্রীঃ), নানক (১৪৬৯-১৫৩৯খ্রীঃ)। প্রমুখ ছিলেন যুগবিচারে তাঁরই সমকালীন। এঁদের সবারই সংগ্রাম ছিল সামন্ত্রতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। ইউরোপে লড়াইটি ঘটেছে সামাজিক সত্তা, বা উৎপাদন সম্পর্ক বদল ঘটাবার জন্য। ভারতে সংগ্রাম চলেছে সামাজিক চৈতন্যের স্তরে। ইউরোপে/এমন কি ষোলো শতকের যেগুলিকে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ সেগুলিতে প্রধান জড়িত ছিল বিভিন্ন স্পষ্ট নির্দিষ্ট বৈষয়িক শ্রেণী স্বার্থ সেগুলি ছিল শ্রেণীযুদ্ধও, ঠিক যেমন ছিল ইংলন্ড ও ফ্রান্সের পরবর্তী আভ্যন্তরিক সংঘর্ষগুলি। যদিও তখনকার শ্রেণীসংগ্রামগুলি চলত ধর্মীয় বাগ্‌ধারা অবলম্বন করে, যদিও বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ, প্রয়োজন ও দাবিদাওয়া থাকত ধর্মীয় পর্দায় আড়ালে, তাতে বিষয়টায় বিশেষ কিছুই বদলাত না, তদানীন্তন পরিবেশ থেকে বোঝা যায় সহজেই।' (জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, এবং ঐ বৈপ্লবিক বিরোধিতা রূপ নিয়েছিল সেখানে অতীন্দ্রিয়তা, প্রকাশ্য বিরুদ্ধ বিশ্বাস ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের

চৈতন্য আবির্ভাব-পূর্ব ভারতে মুসলিম সমাজে সুফী - সম্প্রদায়গুলি এক ধরনের অতীন্দ্রিয়তা মিষ্টিসিজমে বিশ্বাসী ছিল। গোটা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী ধরেই স্বৈরতন্ত্রী সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শাসনের ধর্মীয় তাত্ত্বিক উলেমাদের সঙ্গে, প্রজাশক্তির বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামসমাজ ও শহরের কারিগর - গিল্ডগুলির আধ্যাত্মিক তাত্ত্বিক সুফীদের চলেছে বিরোধ। নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ যেমন গ্রামের উপরে চড়া খাজনার চাপ বাড়িয়েছে, তেমনি শহরের কারিগরদের উপরে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিদানহীন নিরঙ্কুশ চাপ এবং নগরজীবনে পণ্যের ঊর্ধ্বমূল্য নিম্নবর্গীয় শহরবাসীদের জীবন করে তুলেছিল দুর্বিষহ। রাজশক্তির ধর্মীয় প্রতিনিধি উলেমাদের সঙ্গে প্রজাশক্তির আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিদের সংগ্রাম তাই তীব্র হয়েছে। ঐ শ্রেণী সংগ্রামগুলিও চলেছে 'ধর্মীয় বাগ্‌ধারা অবলম্বন করে'। 'পরমাত্মা ও জীবাত্মা,' ব্রহ্মান্ড ও দেহভান্ডের ঐ সংগ্রামেরই প্রতিফলন– যেখানে 'ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভান্ডে'র সামাঞ্জস্য আদর্শ শাসকশক্তিও তারই অনুগত প্রজাশক্তির প্রতীক হয়ে এসেছে। যে রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে আনুকূল্য করতে পারে না, তার প্রতি সশ্রদ্ধ হওয়াও তাই ছিল অসম্ভব। এ যেন অনেকটা সোশাল কনট্রাক্টের তত্ত্ব। আর তাই, এর বিরোধী ছিল উলোমার– যাঁরা নিরঙ্কুশ শাসকদের শোষণভিত্তিক আধিপত্য দৃঢ় রাখার তাত্ত্বিক ছিলেন।

ঐ উলেমাদের বিরুদ্ধে সুফী প্রতিবাদ, ভারতীয় গ্রাম সমাজের ট্রাইবাল স্মৃতি শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, কি হিন্দু কি মুসলিম বা

খ্রীষ্টান, সব ধর্মের মধ্যেই রয়েছেন সবার ঊর্ধ্বে ব্রাহ্মণ, আল্লাহ্ বা জেহোবা। কিন্তু রাজশক্তির বিপরীতে, যে প্রজাশক্তি, দৈবশক্তির বিপরীতে যে মানবিক শক্তি– যেমন তারই প্রকাশ 'শুনরে মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই।' সবার ঊর্ধ্বে মানুষকে উপস্থাপনা, বৈষ্ণবদের এই 'মানুষ সত্য' এই শিকড়ের বিদ্রোহ। বলা বাহুল্য, গোলোকবাসী বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণও মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। বিমূর্ত ঈশ্বর নন।

ঐ যুগপর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত সুফী ধর্মগুরু ছিলেন নিজামুদ্দিন আওলিয়া (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রীঃ)। তিনি হিন্দু প্রজাকুলের প্রতি শাসকদের সহনশীলতা ও তাঁর ভক্তদের কাছে উচ্চ নৈতিক আদর্শ দাবি করেছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রীঃ) ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা। বহুক্ষেত্রেই তিনি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সঙ্গে তুলনীয়। তিনি তাঁর গীতিকবিতায় সাধারণ মানুষে সুখ দুঃখ তুলে ধরেছিলেন। যেমন, 'সুলতানের মুকুটে যে মুক্তাঞ্জলি ঝমকাচ্ছে, সে সবই গরিব প্রজার চোখের জলের রমাট বাঁধা রক্ত'। রাজসভার ভাষায় বাইরে হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁর কবিতা ও দোঁহা ভারতীয় সাহিত্যের জলবিভাজিকা। তাঁর রচনায় ধরা পড়েছিল মানুষে মানুষে সহমর্মিতা। একাধিক আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যেরও উদ্ভব তখন। গুজরাটি, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অবধী হিন্দু, বাংলা প্রভৃতি উন্নত সাধারণ ভাষার পরিণত হচ্ছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে একটি বিকাশমান বাজার জনযোগাযোগ ও প্রশাসনিক ঐক্য এক একটি আঞ্চলিক সাধারণ ভাষার উদ্ভব ঘটাচ্ছিল। এমনকি ঐ সময়েই ফার্সি গদ্যে ইতিহাস রচনাও শুরু হয়। এ সময় প্রয়োজন হয় গণধর্মেরও।

কবীর ছিলেন জুলহা (তাঁতি', নামদেব ছিলেন দর্জি, নানক ছিলেন লাহোরের শস্যবিক্রেতা। বলা বাহুল্য, এই তিনজনই ছিলেন উৎপাদন ও বিপণনের কাজে নিযুক্ত নিচুতলার মানুষ। কেবল শ্রীচৈতন্যই ছিলেন উচ্চ ব্রাহাণ বংশ সম্ভূত, ব্রহ্মবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত ও পন্ডিত। তবে তাঁর পূর্বসূরী হিসাবে অদ্বৈতাচার্য যে সংকীর্তনের সূত্রপাত ঘটান, আর শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত নাম সংকীর্তন সুফীদের যৌথ নীতি - উপাসনা, আখর দেওয়া কাওয়ালির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বৈদিক যজ্ঞ বা দ্রাবিড়ীয় পূজায় ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক বা পুরোহিত যজমানের প্রতিনিধিত্ব করে। সে উপাসনাপদ্ধতি ব্যক্তিমূলক। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিপ্রকাশ পদ্ধতিটি ছিল যৌথ, জাতিয়ধর্ম ভেদাভেদীন, সমষ্টিমূলক। নুতন প্রজাধর্মর রূপ ছিল তা।

ভক্তিবাদীদের আন্দোলন মুয়েনৎসরা, ওয়াট টাইলার বা তাবোরপন্থীদের মত রক্তক্ষয়ী না হলেও, তা ভারতের দু স্তরের সামন্ততন্ত্রের গোড়া ধরে টান মেরেছিল। একটি তার ভারতের গ্রাম সমাজভিত্তিক এবং কৃষি ও হস্তশিল্পকে বাহন করা 'যজমানি' সামন্ততন্ত্র। এই সামন্ততন্ত্র জাতিভেদ প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রথা অনুযায়ী তা ছিল উচ্চকোটির জন্য সামাজিক উদ্বৃত্ত সংগ্রামের হাতিয়ার। দ্বিতীয় সামন্ততান্ত্রিক স্তরটি ছিল সামরিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল। এটি গড়ে উঠল, সামরিক অভিযান ও সৈন্যশিবির ভিত্তিক হয়ে। এই সমস্ত স্তরে সামরিক সামন্ততন্ত্র কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন ছিল উদ্বৃত্ত সংগ্রহকারী অপর দিকে ছিল নানা শাস্তিমূলক অভিযান চালিয়ে লুণ্ঠনকারীও। প্রথমটির হাতিয়ার ছিল জাত-পাত। আর দ্বিতীয়টির ছিল শস্ত্রশক্তি। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামোটি না বদলিয়ে তুর্কো-আফগানরা তারই ঘাড়ের উপরে চালিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয়টি। আর, এই দুই সামন্ত প্রভুদের চাপের তলায় নিষ্পেষিত মানুখের ছিল 'ত্রাহি ত্রাহি' রব। তবে, যজমানি সামন্ততন্ত্রের পরিসর ছিল যেমন গ্রামে, শস্ত্রপাণি সামন্ততন্ত্রে অবস্থান ছিল শহরের। কে. এ. নিজামীর মতো তুর্কীরা ছিলেন নগরপ্রেমিক মানুষ। তাই আরবি ভাষায় শহর ও সভ্যতা শব্দ দুই একই বীজ থেকে নিষ্পন্ন (তমুদ্দুন মাদোনিওয়াৎ)। এই দ্বিতীয় মার্গের সামন্তপ্রভুরা উন্নততর বিলাস দ্রব্য, সমরাস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের প্রয়োজনে কারিগরি ব্যবস্থাকে উন্নততর করে তোলে। ফলে শহরের শ্রমিক ও কারিগরদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, সওদাগরদের অভ্যুদয় ঘটেছে, মুদ্রা - বনাম - পণ্য অর্থনীতির সূত্রপাতও দেখা দিয়েছে। মজুরি ব্যবস্থারও পদক্ষেপ ঘটেছে? ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজনে গ্রামীণ উদ্বৃত্তের জন্য চাপ বেড়েছিল। কারিগরদের উপরেও শোষণের মাত্রা ছিল ক্রমবর্ধমান। আবার, নিয়মিত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য খরচ সংগ্রহ করার জন্য অঞ্চলে অঞ্চলে বণিকদের প্রাথমিক সঞ্চয়ের দিকেও হাত বাড়ায় সমরবাদী সামন্ত শক্তি। এ ভাবে, কারিগর, কৃষক ও বণিকদের মধ্যেও এক ধরনের মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। এই মৈত্রীই অঞ্চলভিত্তিক স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা। আকাঙ্খিত অবস্থাটি বঙ্গদেশে হুসেনশাহী (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রীঃ) শাসনের সময় অনেকখানি অর্জিত হয়। সমরতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়শক্তি ও তার শস্ত্রপাণি প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধো তো বটেই, উল্লিখিত দুই বর্গীয় সামন্তবাদী বলপ্রয়োগ ও ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে কেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়েই চলেছিল লড়াই। তবে, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এ লড়াই চলেছিল মুখ্যত সামাজিক চৈতন্যের স্তরে। আঞ্চলিক সাহিত্য, সাধারণ ভাষা ও লোকধর্ম এবং উৎপাদন বিশেষত্ব কার্যত জাতিসত্তা বা ন্যাশনালিটি গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হিসাবে জন্ম নিচ্ছিল। কেন্দ্রাতিগ আঞ্চলিক প্রশাসনেরও উদ্ভব ঘটেছিল।

দুই

সাধারণ অর্থে ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার তুলনায় গুণগতভাবে ভিন্নতর ছিল না চৈতন্যকালের বঙ্গদেশের অবস্থা। 'এশিয়ার অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল : কোষাগার বা রাজস্ব, অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠন বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ।' (ভারতে বৃটিশ শাসন : কার্ল মার্কস)। তা ছাড়া মূল উৎপাদনের উপায় ছিল যে জমি, তার মালিকানা ছিল রাষ্ট্রেরই। 'সমাজ কাঠামোর খুঁটি ছিল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে তাঁতী আর সূতাকাটুনির খাঁটি অক্ষৌহিণীর সৃষ্টি।' রাষ্ট্র প্রবর্তিত সেচবিভাগ ও সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষি ও হস্তশিল্পের মেলবন্ধনে বাঁধা যে বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার এককই ছিল গ্রাম-সমাজ। প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বংশানুক্রমিক জাত-পাঁতের ধারা, বিশেষ বর্ণে বিশেষ ধরনের উৎপাদন বা সেবাকার্য সীমাবদ্ধ রেখেছে। এবং এই গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা উদ্ভবের ভিত্তিতে ছিল ট্রাইবেরই ভূমিকা। ১৯৫৭৫৯ সালের 'অর্থনীতি বিষয়ক পাণ্ডুলিপি' -তে মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে এইসব গ্রাম-সমাজের জমি ছিল সম্প্রদায়ের জমি বা কমিউন্যাল প্রপার্টি। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী সত্তা বা এনটিটি ব্যক্তিকে জমি ব্যবহার করার সুযোগ দিত বটে, কিন্তু সর্বশেষ আধিপত্য থাকত ঐ গোষ্ঠীসত্তারই - বা শেষ বিচারে যে - সত্তার রূপ নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশক্তি। 'প্রাচ্যদেশের স্বৈরতন্ত্র তার আপাত আইনগত সম্পত্তির অনুপস্থিতিসহ উপজাতীয় বা যৌথ (কমিউন্যাল) সম্পত্তির উপর গড়ে উঠেছে। প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমশিল্প ও কৃষির সম্মিলনে ছোট ছোট সম্প্রদায়কে বাহন করে তা সৃষ্টি হয়েছে। আর তার ফলে ঐ গোষ্ঠীসমাজ সম্পূর্ণভাবে

স্বর্নিভর হয়ে গড়ে উঠেছে এবং ধারণ করেছে পুনরুৎপাদনের সমস্ত শর্ত। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের একাংশের উপরে ছিল উচ্চতর গোষ্ঠীর অধিকার, যা শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তিতে পর্যবসিত হত। এই উদ্বৃত্ত শ্রম একদিকে ছিল যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য সম্মানী, অন্য দিকে তা ছিল সাধারণ শ্রম হিসাবে সমগ্র গোষ্ঠীরই গৌরব। অংশত তা পেয়ে থাকত যথার্থ স্বৈরাচারী শাসক, কিছুটা পেত কল্পিত উপজাতীয় সত্তা, অর্থাৎ দেবতা।' বলা যায়, স্বৈরাচারী শাসক ও কল্পিত উপজাতীয় সত্তা ছিল পরস্পরের পরিপূরক। এভাবেই তাই সম্পূরক ছিল রাজস্ব বা বলি এবং দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর উদ্বৃত্ত। তা ছাড়া, বাণিজ্যের সুযোগ থাকলে কিংবা রাষ্ট্র প্রদান বা রাজপুরুষের আহরিত উদ্বৃত্ত উৎপাদন (রাজস্ব) সেখানে শ্রমের বিনিময়ে ব্যবহার করার সুযোগ ঘটত– অর্থাৎ শ্রম তহবিলের খরচাপাতি হিসাবে ব্যবহার করা যেত– সেখানে গড়ে উঠত শহর।

এই গ্রামীণ জীবন ধর্মও ছিল বড় বিচিত্র। গ্রাম-সমাজের রক্ষক দেব - দেবীর থান ছিল সমাজের সাধারণ সম্পত্তি বা পতিত কোনো জায়গায়। আর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রশাসনিক প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠিত মন্দ্রি ছিল দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির এলাকার মধ্যে (পরবর্তীকালে ওয়াকফ্ জমিতে যেমন মসজিদ)। এমন কি দেবতাদের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল। সংগঠিত ও সংস্কৃত মন্ত্রাসুসারী দেবতা এবং গ্রামদেবতা। উচ্চকোটি সমাজের ছিল উচ্চতর দর্শনভিত্তিক দেবতা, ঈশ্বর ও পূজার্চনা, যাগযজ্ঞ। অন্যদিকে লোকায়তে ছিল কৃত্যভিত্তিক গ্রামদেবতা উপাসনা। কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক 'মনসামঙ্গ'লে শৈব চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসার বিবাদের মধ্যে উচ্চকোটী সমাজের দেবতার সঙ্গে লোকায়ত দেবীর বিবাদের তাৎপর্য অন্বেষণ করেছেন। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেবদেবীকে বাহন করেও প্রকাশিত হয়েছে।

সেন রাজবংশের (১০৬৮-১২০২ খ্রীঃ) শাসনের যুগে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত ভোগের বহু চাঞ্চল্যকর চিত্র পাওয়া যায়। সেন রাজারা বিশেষভাবে যে নতুন উচ্চকোটি সামাজিক বর্গ গড়ে তুলেছিলেন, তার সঙ্গে ছিল উপজাতির সত্তার বৈপরীত্য। সামাজিক স্তরে যে বৈপরীত্য ছিল বৈরীমূলক। বঙ্গদেশে ঐ ব্রাহ্মণ্যই অধিকার প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া সেন শাসনের যুগে চলে, তাতে গ্রাম - সমাজের মধ্যে যথেষ্ট চাপ বেড়ে যায়। গ্রামের সাধারণ জমিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাসের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম-নিষ্কাষিত উদ্বৃত্তে ও অন্য রাজ্য লুণ্ঠন করে শহরগুলিতে এক শ্রেণীর নাগরিক সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। লক্ষণ সেনের সভাকবি ধোয়ী 'পবনদূতে' ধনী নগরবাসীদের বিলাসব্যসনের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে তার ঢের উদাহরণ রয়ে গেছে। নাগরিক জীবনের যে যৌনক্রিয়াই মূল লক্ষ্য ও সুখ। 'নগরের প্রাসাদে প্রাসাদে রমণক্লান্ত রমনী, তাদের রতিজ মান অভিমান, নদীসলিলে জলকেলিরত যুবতীদের প্রণয়কলরোল, তীকে তীরে কুঞ্জবনে রতিচতুর নারীদের শৃঙ্গারলীলা। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের প্রণয়রামণী নৃত্য, প্রেমের তৈলে চিত্তের শিখা সিক্ত করে কামাগ্নি জ্বালিয়ে নিবিড় তিমিরে প্রেমিকার অভিসার। সুন্দরী বণিতাদের রমণীয় ভ্রূবিলাস, অচেতন সাগরে-সরিতে মিশে প্রণয় লীলা' –এই হল রাজধানীর নাগরিক জীবনের চিত্র সেখানে (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, সপ্তদশ খণ্ড ঃ প্রধান উপদেষ্টা গৌরীনাথ শাস্ত্রী)। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মণি মুক্তার ব্যবহার জানতেন না, বিজয় সেনের দাক্ষিণ্যে তাঁরা এমনই সম্পদশালী হয়েছিলেন যে, তাঁদের পত্নীদের শহরবাসী ধনাঢ্যদের ঘরণীরা বিলাসব্যসন শিক্ষা দিয়েছেন এমন প্রমাণ রয়ে গেছে বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে। ঐ হঠাৎ-ধনী ব্রাহ্মণপত্নীদের মুক্তা, পান্না, রুপোর টাকা ও জড়োয়ার ব্যবহার শেখানো হচ্ছে তাদের চেনা ফুল-ফলের রঙের প্রতি তুলনা দিয়ে। এতে বোঝা যায়, কি ভাবে এক শ্রেণীর অনুৎপাদক ব্যক্তির সম্পদ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক শোষ বেড়েছে, শাসনের চাপ পড়েছে, ঘটেছে তার পাশাপাশি শহরের সমাজে নৈতিকতার অধঃপতনও। (হিষ্ট্রি অব অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গলঃ আর. সি. মজুমদার, পৃ ৩৪০)। এই শাসক - শাসিতের নিদারুণ বৈরীমূলক বিযুক্তির পর্যায়েই ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে বঙ্গদেশে ঘটেছে বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণ ও বিজয় এবং তার অনুসঙ্গী দ্রুত মুসলিম শাসনের বিস্তার। কেন সাধারণ জনগণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রাজধানী রক্ষা করেনি, তার কারণ এই রাজায় প্রজায় চরম বিভাজন। 'শূন্য পুরাণে'র রামাঞি পন্ডিত এই অতি ব্রাহ্মণ আচরণের বিরুদ্ধে তুর্কী আক্রমণকে আর্শীবাদ মনে করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে 'এ কাব্য হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের লেখা,...যদি শূন্য পুরাণের বর্ণিত ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করা যায় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে সেকালে বাংলায় নীচ জাতিরা মুসলমান কতৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিনাশ অতি আহ্লাদের বিষয় মনে করত। এক কথায় তারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণ - অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোকের উদ্ধারকর্তা মনে করত।' (প্রমথ চৌধুরী ঃ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান)। 'শূন্য পুরাণে' তাই রামাঞি পন্ডিতের কাছে 'ধর্ম হইল জবনরূপি/ মাথা এতকাল টুপি / হাতে সোভে ত্রিকচ কামান। ...জতেক দেবতাগণ/সভে হয়্যা একমন/ আনন্দে ত পরিল ইজার।' অথচ ঐ ব্যক্তিয়ার খিলজীই তিব্বত অভিযান করতে গিয়ে জনগণের কাছেই প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবকৎ-ই-নাসিরি অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যবাহিনীকে যেমন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি জনগণ ফসল ও পশুখাদ্য জ্বালিয়ে দিয়ে, সমস্ত গ্রাম ছেড়ে গিয়ে পুরো পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। পরাস্ত ও বিপর্যস্ত বখতিয়ার দেওকোটে (পঃ দিনাজপুর জেলা) ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। সেই জনযুদ্ধের বিষয়ে কবি লিখেছেন ঃ 'সৈন্যরা কোনো রুটির চিহ্ন দেখেনি, দেখেছে সূর্যের গোল চাকতি। গরু ঘোড়া কোনো খড় বা দানা দেখেনি, দেখেছে রামধনুর রঙ।' (গুলাম হুসাইন সামিল -এর ফারসী থেকে মৌলবী আবদুস সালাম -এর ইংরাজি অনুবাদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০২)।

যে যাই হোক, ইলিয়াসশাহী হাবসী শাসনের যুগে বঙ্গদেশের রাজনীতিতে অরাজকতা বেড়েছিল বটে, তবে কার্যত মোহাম্মত বিন তুঘলঘের রাজত্বের শেষ দিক থেকে প্রায় দুশো বছর বঙ্গদেশ দিল্লীর শাসনমুক্ত থেকেছে (১৩৩৮ - ১৫৩৮ খ্রীঃ)। এবং এ সময়েই নানা নগর ও শিবির পত্তনে কারিগরি শিল্পের বিকাশও ঘটে। সোনার গাঁও, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি প্রশাসনিক ও বাণিজ্য কেন্দ্রের যথেষ্ট উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছিল। ইবন বতুতা এসময় বঙ্গদেশে এসেছিলেন (১৩৮৬-৪৭ খ্রীঃ)। তাঁর বিবরণীতে দেখা যায়, তখন বঙ্গ দেশে প্রচুর চাল পাওয়া যেত। নীরদ রায় দেখিয়েছেন, ১৯৪৮ সালের টাকার হিসাবে তখন সাত টাকায় পৌণে নয় মণ চাল বা আটাশ মন ধান পাওয়া যেত। একটি দুগ্ধবতী গাভীর দাম ছিল ঠিক একুশ টাকা। পনেরো গজ সূক্ষ্ম সূতী কাপড়ের দাম ছিল চৌদ্দ টাকা। তিন জনের পরিবারের খাদ্য সামগ্রীর পিছনে ব্যয় ছিল বছরে সাত টাকার মত (আবদুল করিম ঃ বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ১৯৪)।

ইবন বতুতা চট্টগ্রামের বন্দরে বহু জাহাজ দেখেছিলেন। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও -এর কথাও তিনি লিখেছেন। ইবন বতুতার ভাষ্য অনুসারে

বোঝা যায় যে, প্রশাসক, সামরিক প্রধান ও বণিকেরা শহরবাসীই ছিল। তাঁর বর্ণনার হবংক শহরের হিন্দুরা ছিল জিম্মি। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেকই রাজস্ব দিতে হত তাদের। তাছাড়া অন্যান্য করও তাদের দেয় ছিল। বলা বাহুল্য, ধর্মকে বাহন করে নতুন শাসকেরা বেশ বড় মাপের উদ্বৃত্ত পেতে পারতেন। এজন্য ধর্মান্তরণ করার দিকে তাঁদের ঝোঁক ছিল না। বরং তাঁরা হিন্দু অভিজাতদের সহযোগীই মনে করতেন। খিলজী, তুঘলকী, ইলিয়াস - শাহী বা হাবসী শাসকেরা শস্ত্রপাণি সমরগোষ্ঠী ছিলেন মাত্র। তরোয়ালের ফলার উপরেই ছিল তাঁদের রাজসিংহাসন পাতা। ফলে, তাঁদের নির্ভরস্থল ছিলেন বাঙালী হিন্দু অভিজাত কুলও - যে অভিজাতকুল সেন শাসনের যুগ থেকেই যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। এই সব শাসনপরম্পরায় সেন যুগের চাপানো বাঙালী উৎপাদন সম্পর্কের কোনো লক্ষণীয় বদল হয়নি। যা বদল হয়েছিল তা হল, নানা সমরাভিযানের জন্য চাষী, কারিগর ও বণিকদের উপরে চাপ বৃদ্ধি। এ সময়ে গড়ে উঠেছিল শহরে শহরে সম্পত্তিহীন অথচ বেতনভোগী সৈনিক। কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী ও উঞ্ছজীবীর ভিড় যারা দরবৃদ্ধি ও বেকারির চাপে ভুগত। প্রয়োজনে পুরনো রাজশক্তির বদলে এই নাগরিকরা সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া নতুন শাসকদের পক্ষও নিত। (politics and Society during Early Medieval Period : Urban Revolutions, Mohammad Habib)। তবে একটা ব্যপার স্পষ্ট। যখন সমরাভিযান হত না, গ্রাম থেকে তুলে আনা বিপুল উদ্বৃত্ত কিছুটা মূলধন গঠনের ভূমিকা পালন করত। যার ফলে বন্দর, নতুন শহর বা দূর্গ, রাজপথ, বুরুজ প্রভৃতি নির্মাণ করা হত। এ ছাড়া কারিগরদেরও নিয়োগ বাড়ানো যেত। বাণিজ্যের উপযুক্ত পণ্যও শহরে উৎপাদন হতে পারত। আবার, মৌলবী বা ব্রাহ্মণ-পন্ডিতেরা সম্পন্ন ভূ-স্বামী বা রাজকোষ থেকে সিধা পেতেন। কখনো গ্রাম বা তালুক দেবতা বা ব্রাহ্মণ সেবায়, বা মসজিদের বা মক্তবের ব্যয়ের জন্য স্থিরীকৃত হত। এভাবেই নবদ্বীপ ও পাণ্ডুয়ার ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও মওলানা - মৌলবীদের তন্‌খা জুটত। বলা বাহুল্য, ধর্মান্তরণে রাজশক্তির স্বার্থই বিপন্ন হত। রাজস্বের অতি চাপ কৃষকদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। একসময়েই প্রচুর ফকির দরবেশ ও সুফী সাধকেরা বঙ্গদেশে আসেন। হিন্দু ও মুসলিম প্রজাশক্তির পক্ষে সুফীদের ভূমিকা, হিন্দু বা মুসলিম কোনো অভিজাত গোষ্ঠীই পছন্দ করতেন না। আজম শাহকে লেখা মওলান বলখীর চিঠি তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেয়। স্বভাবতই হিন্দু প্রজাবৃন্দের কাছে দুটি প্রশ্ন জরুরি হয়ে দেখা দেয়। এক, দেশী উচ্চকোটি অভিজাতদের বাহন করে তুর্কী শাসন - যা দু বর্গীয় সামন্ততন্ত্রের চাপে প্রকৃতিপুঞ্জকে চূর্ণ করেছে। দ্বিতীয়, প্রকৃতিপুঞ্জে আস্থাবান একটি স্বদেশী শাসন। প্রথম শাসন ব্যবস্থায় সেনবংশের সময় থেকে চলে আসা মধ্যবর্তী এক সমাজ অংশকে শক্তিধর করে রাখাটা ছিল জরুরি। যেন স্বৈরাচারী দেবতা ও যজমানের মধ্যে এক পুরোহিত। এমন সব শাসক বংশের পরিবর্তন ঘটত 'প্রসাদ বিপ্লব' মারফৎ। সামন্তবাদী মধ্যবর্তী অংশ তার জাত-পাঁত ধর্মের যখন যেমন প্রয়োজন তেমন অস্ত্র ঠিকঠাক ব্যবহার করত। আর অসহায় সাধারণ মানুষের তখন পরিত্রাণের জন্য 'মঙ্গলচণ্ডীর' গীত গাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর মধ্যবর্তী অংশটি তাদের বিভূতি দেখাবার জন্য ছাগ-মোষ বলির যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখত। তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচারের মধ্যে মদ্য-মাংসের ছয়লাপ ছিল। পঞ্চমকার সিদ্ধির নামে ব্যভিচারের কুলকিনারা ছিল না।

তিন

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে। শ্রীহট্টে একদা ছিল বৌদ্ধদের রক্তমৃত্তিকা বিহার। চট্টগ্রামেরই বাণিজ্য বন্দর ব্যবহার করে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছিলেন বহু ফকির দরবেশ। শাহ জালার খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন শ্রীহট্টেই। সেন রাজাদের আমলে বৌদ্ধদের উপরে আক্রমণের স্মৃতি নিশ্চয়ই শ্রীহট্টে তখনো অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে বৌদ্ধরা তখন পীড়িত হচ্ছিলেন। ''দুখিন্যা মাগিতে জয়/ যার ঘরে নাঞি পায়/ সাঁপ দিয়া পুড়া এ ভুবন।...বলিষ্ঠ হইল বড়/ দশ বিস হয়্যা জড়/ সন্ধম্মিরে কর এ বিনাস।'' (শূন্য পুরাণ) । অর্থাৎ দশ বিশ জনের বাহিনী বৌদ্ধদের খতম করার অভিযান করেছে যার পেছনে রয়েছে রাজশক্তি। সুতরাং 'সন্ধম্মিরা' যে শাহ জালালের মতো মানুষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে মুদ্রা বনাম পণ্য বিনিময়ের অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। এ অঞ্চলের নতুন একদল মানুষ তাঁদের সরল ধর্মের উদাহরণও রাখছিলেন। পণ্যের তো আর জাত - পাঁত নেই, পণ্য উৎপাদনকারীর জাত-পাঁত আছ! গঞ্জে বিকোতে এলে সব শ্রমোৎপাদিত পণ্যই মুদ্রাকে বাহন করেই বিনিময় হয়। এ বিনিময়ভিত্তিক বাণিজ্য-ভুখণ্ডে ধর্মীয় আচরণও সরল হয়ে আসছিল। অবশ্য জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে পাঠাভ্যাস করতে এসে সংসার পেতেছিলেন। নবদ্বীপে সমাজের উচ্চকোটি ব্রাহ্মণেরা দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ভোগদখল অথবা পুরোহিত বা গুরু হিসাবে সামাজিক উদ্বৃত্তভোগী ছিলেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি টোল ও চতুষ্পাঠীর খরচ যোগাতেন রাজশক্তি বা বিত্তবান অভিজাতকুল। ফলে ব্রাহ্মণেরাও ছিলেন শাসকদেরই হাতে ধরা। তাঁদের সঙ্গে প্রশাসনের প্রতিনিধির সম্পর্কও নিবিড়তর থাকবারই কথা। কেননা যে ধর্ম আন্দোলন জাত-পাঁত ভুলে সব ধর্মীয় মানুষকেই কোল দেয়, তার অভিঘাতে গ্রাম সমাজভিত্তিক বলীও বাতিল হয়ে যাবার কথা। দেবোত্তর - ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির অস্তিত্ব বিষয়েও তখন প্রশ্ন ওঠে। রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী ঐ গোষ্ঠীরও মর্যাদার অবমূল্যায়ন ঘটে। কেন কাজী নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের কথা শুনে কীর্তন বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, তার সামাজিক অর্থও এর থেকেই পাওয়া যাবে। এবং নবদ্বীপে ঐ 'পাষণ্ডী'দের সঙ্গে নাগরিকদের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব আসলে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

জগন্নাথ মিশ্র অবশ্য ধনবান ছিলেন না। তবু মনে হয়। তাঁর স্মৃতিতে ছিল শ্রীহট্টের ভাবসংঘর্ষ– যা নিশয়ই তাঁর মনোজগতে ছায়া ফেলেছিল। এবং নবদ্বীপের প্রথাচালিত জীবনযাপনে বীতশ্রদ্ধ নির্ধন পিতা জগন্নাথের প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এবং দ্রারিদ্র্য অত্যন্ত বেশি না থাকলে পিতৃবিয়োগের পর বিশ্বম্ভরও পৌগণ্ড বয়সেই চতুষ্পাঠীর শিক্ষক হতেন না, বা কৈশোরেই পূর্ব্ববঙ্গে যজমানদের কাছে প্রণামী সংগ্রহে বেরোতেন না। এবং গরিব ছিলেন বলেই, জগন্নাথের বাড়ি থেকে শিশু নিমাইকে তস্কররা অপহরণের চেষ্টা করেছিল– যা ধনাঢ্যের বাড়িতে সম্ভবপর ছিল না। পর্তুগীজ পরিব্রাজক দুয়ার্তে বারবোজ ১৫১৮ সলে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে Moorrish Merchant -রা বিধর্মী শিশুদের বান্দা বা বাঁদী করার জন্য কিনতেন।

চৈতন্যদেরে যৌবনপ্রাপ্তির পর্বে বঙ্গদেশে সত্যিকারের বাঙালী শাসনের সূত্রপাত ঘটে, সে শাসন পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থা থেকে গুণগতভাবে অনেকখানি ভিন্ন। ইলিয়াসশাহী শাসন পর্বে ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১১, ১৪১১, ১৪১৪, এবং ১৪৩৮-৩৯ সালে বাংলাদেশ থেকে চীনে দূত প্রেরিত হয়েছিল। ১৪০৯, ১৪১৩ এবং ১৪১৫ সালে চীনা দূতেরা বঙ্গদেশে আসেন। চীনা দূতদের বিবরণীতে দেখা যায় বাঙালী চাষীরা ছিল খুবই কর্মঠ। মাঠে তিনবার ফসল ফলত। ধান, তিল, বাজরা, বরবটি, আদা, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, নারকেল, তাল, খেজুর, গম ও সকল রকম ডাল উৎপাদন হত। তাছাড়া নানা ধরণের সূতীবস্ত্রও উৎপাদিত হত। এক তংকার সঙ্গে ১০, ৫২টি কড়িবিনিয় হত। চীনা বর্ণনায় জানা যায়, বয়ন-শিল্প ও কৃষ্টি হাত ধরাধরি করেই চলত। এই অতি স্বাচ্ছন্দ্যে ছবি কতটা রাজপুরুষের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিসজ্ঞাত বা কতটা সত্য তার প্রমাণ মেলা ভার। বরং চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় সাধারণ মানুষ ধানের দরে ঈষৎ হ্রাসবৃদ্ধিতে কেমন বিচলিত বোধ করতেন। ('কেহ বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে/ তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে।' (চৈতন্যভাগবত, আদি চর্তুদশ অধ্যায়)।

উচুঁতলার লোকজনের তুলনায় নীচু তলার মানুষের অবস্থা অবশ্যই ভিন্ন ছিল।...বস্তুত, তাদের কেনবার ক্ষমতা তেমন একটা ছিল না। যদিও বঙ্গদেশে জিনিসপত্রের দাম সস্তাই ছিল, তা সত্ত্বেও জনগণের অতি দামবৃদ্ধি বিষয়ে অভিযোগ তোলা নিয়ে ইবন বতুতার বক্তব্যের যর্থাথতা পাওয়া যাবে। জানিনা সময়ে সময়ে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত সরকার কেমনভাবে তার মোকাবিলা করত। জয়ানন্দ জানাচ্ছেন, দুর্ভিক্ষের ফলে বহু মানুষ দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়। ...যদিও বঙ্গদেশ ছিল প্রাচুর্যের দেশ। তা সত্ত্বেও কৃষিপণ্যের সহজ লভ্যতা ও অতি কম দানের ফলে কৃষকের অবস্থা ছিল খারাপ। রাষ্ট্রের রাজস্ব চাহিদা ছিল অন্যান্য কর বাদ দিয়েও কোনো কোনো অংশে অপরিসীম দারিদ্র্যের কথাই মনে পড়িতে দেয়। যে যুগের সাহিত্যেও দারিদ্র্যের ছবি আছে। দেখেছি নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্য তাঁর কন্যার বিবাহে পাঁচটি মাত্র হরিতকী যৌতুক দিতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ শ্রীধরকে নীচুস্তরের দেবী চন্ডী বা মনসা পূজা করে জীবিকা নির্বাহের উপদেশ দিচ্ছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা বারোমাস্যার কথাতো আমরা সবাই জানি। ''These gilmese of the condition of common peo;le, indicate a sharp contrast between the upper and the lower grades of population.'' (Momatazur Rahman Tarafdar : Husain Shahi Bengal: 1494-1538) এই দারিদ্র্য পীড়িত ও সামাজিক ভাবে নিপীড়িত নীচুতলার মানুষজনই বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের 'নাগরিয়াদের বিরোধী উচ্চকোটি মানুষেরাই 'পাষণ্ডী'। এই 'পাসণ্ডী'। এই পাষণ্ডী'দের সঙ্গেই দীর্ঘকাল, কি সেন রাজবংশ কি তার পরবর্তী মধ্যযুগীয় শাসনকালে, 'নাগরিয়া'দের বিরোধ রয়েই গেছে। চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছু কালের মধ্যই রচিত। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থে বহু প্রমাণ রয়েছে যেখানে নাগরিকরা কেবল শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহই করছেন না, কখনো কখনো চৌরিচৌরাও ঘটিয়ে দিচ্ছেন। নেতৃত্বহীন নাগরিয়াদের মধ্যে দীনহীন জনগণের প্রতি উচ্চকোটি সমাজের বিদ্রূপও লক্ষণীয় ('কোনো পাপী বলে হের দেখা ভাই সব / খোলাবেচা মিনসাও হইল বৈষ্ণব।।/ পরিধান বস্ত্র নাই পেটে নাই ভাত।।/ লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।/ নাগরিয়াগুলা বোলে মাগি খাই মরে।/ অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে।' (চৈতন্যভাগবত ঃ মধ্য ত্রয়োবিংশ অধ্যায়)। 'এই পাষণ্ডী'রাই কাজীর কান ভাঙিয়ে ছিল নতুন ভক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কাজী নাগরিয়াদের নগর সংকীর্তনের বিরুদ্ধেতা করেছিলেন। ঐ নগর সংকীর্তন কার্যত ছিল উচ্চকোটির সম্ভ্রম জাগানো জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা ও পূজার সরব প্রতিবাদ। গ্রাম - সাধারণ ধর্মমত হিসাবে এসেছিল প্রথাবিরহিত কেবলমাত্র নাম সংকীর্তন। তুলনা তার ঈশ্বরের মন্দির থেকে যীশু কৃর্তক টাকা পয়সার ফাটকাবাজদের বিতাড়নের সঙ্গে। ইহুদি বা জেনটিল, ফারিসী বা সামারিটান, চর্মকার ও ধীবর সকলেই যেমন একই করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান যীশুর কাছে, তেমনি সর্বজাতই গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণভজনাতেই একাকার– একাত্মা। তারা মানুষ হিসাবে সকলেই সমান। একদা ইহুদিরা নিজেদের ঘোষণা করত ঈশ্বরের 'নির্বাচিত' জনগোষ্ঠী হিসাবে। যীশু তাদের বিরুদ্ধে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং 'একজাত ঈশ্বরপুত্র' বলে, যেমন শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ্যগর্বে অহঙ্কারী উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছিলেন স্বয়ংই অবতার বলে। নাকি উইটেনবার্গ গীর্জায় লুথারের নির্দেশনামা ঝুলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তা তুলনীয়! সামাজিকভাবে সমানাধিকার কেবল কৃষ্ণ নামের দাক্ষিণ্যে - আজও হতে পারে-এ ভাববিপ্লব বর্তমান কালেও তুলনা রহিত। এই জনসাধারণ রাজরাজত্বের ঝড়ঝঞ্জাকে তুচ্ছ করে গাছের মত নীচু ও বিনীত হয়ে বেঁচে থাকে– গাছেরই মত সহনশক্তি তাদের– অমানীদের মান দেওয়াই তাদের স্বভাব, কেবল এক বীজ হরিনাম কীর্তনেই তাদের সর্ব আচার - আচরণহীন ধর্মীয় জীবনের সারাৎসার। । এই meek এবং gentle জনগোষ্ঠী যীশুরও জনসাধারণ শ্রীচৈতন্যেরও। তুলনীয় গোড়ার দিকের খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে এই বৈষ্ণবেরা। পাষণ্ডী আর ফারিসীদের মধ্যেও মিল রয়েছে প্রচুর। ফ্রেডারিক এঙ্গেলহ 'গোড়ার খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে' নিবন্ধে লিখেছিলেন 'কী রকমের লোকের মধ্যে থেকে। নিম্নতম স্তরের মানুষের মধ্য থেকে যা কোনো বৈপ্লবিক মতধারার পক্ষে মানানসই। ...এদের সবারই পক্ষে স্বর্গধাম পড়ে ছিল পিছনে, সর্বস্বান্ত, স্বাধীন মানুষের বেলায় সেটা ছিল একাধারে প্রাক্তন পলিস (polis)-শহর আর রাষ্ট্র, যেখানে তাদের পূর্বপুরুষেরা এক সময় ছিঙ স্বাধীন নাগরিক; যুদ্ধবন্দী দাসদের বেলায় সেটা ছিল অধীনতা আর বন্দীদশার আগেকার স্বাধীনতার সময়, ছোট কৃষকদের বেলায় - বিধ্বস্ত গোষ্ঠীব্যবস্থা এবং এজমালি ভূমি - মালিকানা। বিজেতা রোমের লৌহমুষ্ঠি ভূমিসাৎ করে দিয়েছিল সেই সব কিছুকে।' যে স্মৃতিলাঞ্ছন স্বাধীনতাই ছিল তাদের কাছে 'স্বর্গধাম', বাংলার নাগরিকদের কাছে তাই ছিল 'বৈকুণ্ঠ'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হবার পূর্বেই বিশ্বম্ভর মিশ্র নগর সংকীর্তনের মধ্যে এনেছিলেন সেই স্বাধীনতার স্বাদ। বহু বছরের অবদমিত শৌর্য কাজীদলনে আগুয়ান হয়।

হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ স্বভাব ধর্ম পাইলেন লোকে।
জীবে মাত্র চতুর্ভুজ হইয়া সকল।
না জানিল কেহো কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল।
হস্ত যে হইল চারি তাহো নাহি জানে।

আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে।
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কাহার জিহ্বার নানামত বাদ্য স্ফুরে।
কেহো বলে একে কাজী বেটা গেল কোথা।
লাগ্ পঙ্ এখনে ছিণ্ডিয়া পেলোঁ মাখা।
নড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে মিলায় মাটিতে।

জনগনের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্রোধ ও জ্বালার প্রকাশ রয়েছে এই কাজীদলনে। (চৈতন্যভাগবত ঃ মধ্য, ১৩ অধ্যায়)

এই কাজীদলনের পূর্বেই নগর কোতোয়াল দুই ভাই জগাই ও মাধাইকে বিশ্বম্ভর দলভুক্ত করেছিলেন। সশস্ত্র প্রশাসক শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে, বিপুল গণ-অভ্যুত্থানকে সঙ্গী করে ধর্মীয় পতাকার নীচে জনগণকে জমায়েত করে তিনি তাঁর পার্ষদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধেই ভাবলোকে প্লাবন এনেছিলেন। বলা বাহুল্য, অবধারিত গতিতে যে বঙ্গীয় নিজস্ব বাজার, প্রশাসন এবং ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তারই পরিবপূরক ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ-লোকায়তন– সুফী মতের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালী ভক্তি আন্দোলন। তারই নায়ক, বা প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বম্ভর মিশ্র। বাঙালি রাজশক্তির সঙ্গে সোজাসুজি বাঙালি প্রজাশক্তি মধ্যবর্গীয়দের বাতিল করে দিয়ে সে সম্পর্ক রচনার জন্যে ব্রতী হয়েছিল, তারই সংগ্রামী প্রতিফলন আছে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও ভাববিপ্লবে। এই দ্বন্দ্বসমন্বয়ই শ্রীচৈতন্যে প্রতীক হয়ে উঠেছে। অন্তরঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, বহিরঙ্গে রাধা। একই অঙ্গে ব্রহ্মান্ড ও দেহভান্ড। রাজশক্তি আপাত অর্থে সেখানে যদিও আলাদা, তবু উৎস ও উৎসারের মিল রয়েছে সেই বৈপরীত্যে। যেন অগ্নি ও স্ফুলিংগ। হোসেনশাহী শাসনের কালে সেই যুগসাপেক্ষ যে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটে, তার লক্ষণও স্বয়ং হুসেন শাহের শাসনকালের উদার নীতিতে সমধিত প্রমাণিত হয়। ‘‘The Gradul rapproachment between the ruler and the ruled which characterised this age, ushered in a new ear of socio-political existence. The Hussain Shahis identified themselves with the interest of the people of completey that they were regarded as the children of the soil.” (M. R. Tarafdar. op cir, p 123)

বহুদিন পরে বঙ্গভূমি তার ‘দেশীয়’ রাজশক্তি অর্জন করল। শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষক দুই বর্গীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের সুচীমুখে গড়ে উঠতে শুরু হল একজাতীয় রাষ্ট্রের পথে অভিমুখীনতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবশ্য উপর কাঠামোয় ভাববিপ্লব এনেছিলেন, সমাজসত্তার উপরে তার প্রভাব পড়েছিল বিপুল। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়া তাঁর ধর্ম আন্দোলনকে ‘শ্রদ্ধেয় বাতিলের’, কাঠের মূর্তিকে রূপান্তর ঘটায়, যেমন ঘটেছিল একদিন কাঁটার মুকুট পরা ‘মানব পুত্রের’ ভাগ্যে রোমে –সোনার মুকুট পরা ‘রাজার রাজা’ হয়ে ওঠায়। যেমন বহুবিপ্লবের, বিশেষ ভাবে ধর্মীয় বা উপর কাঠামোর ভাব বিপ্লবের পরিণতি ঘটে। তবু শ্রীচৈতন্য সার্থকনামা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গ সন্তান হয়েই রয়েছেন।